নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার দিব্যদর্শনে—শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা

শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর

(৫)

আমরা এম্‌নি ঘুরে বেড়াই মন্দিরে মন্দিরে, যেমন ক্ষ্যাপা খোঁজে পরশ-পাথর। আঁচলে চাবি বেঁধে, চাবির সন্ধানে ঘুরে বেড়াই।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই প্রশ্নেরই কৈফিয়ৎ দিয়ে বলতেন— ''খেয়াঘাটে অনেক নৌকোই বাঁধা থাকে, কোনটা পারে যাবে, তার সন্ধান নিতে হয়। সব ঘাটেই ঘুরতে হয়, নইলে ঘাটের জ্ঞান কী করে পাবি''?

বিবেকানন্দকে এক নাগা-সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করলেন— ''তোমর গুরুলাভ হয়েছে কি? গুরু ভিন্ন মুক্তির পথ অন্ধকার—''

স্বামিজী এ কথায় তিক্ত হয়ে উঠলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গেরুয়া-রাঙা, বক্ষাবরণ উন্মোচন করে, নগ্নবক্ষে দাঁড়িয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন— ''রামের তীর, আর কৃষ্ণের বাঁশী আমার বুকেই আছে, তোমার দৃষ্টি যদি থাকে ত, নিশ্চয় দেখতে পাবে''— নাগা-সন্ন্যাসী এই কথায় ধ্যানমগ্ন হয়ে বলে উঠলেন— ''তোমার বুকে এক গোঁফ-দাড়িধারী গৃহী-সন্ন্যাসীকে দেখতে পাচ্ছি— এই কি তোমার গুরু? এঁর নাম কী? কোথায় থাকেন?''

অশ্রুভারাক্রান্ত নবীন ভাস্কর বিবেকানন্দ, আনন্দ বিহ্বলে বলে উঠলেন— ''এঁর নামের ত আগেই তোমায় বর্ণনা দিয়েছি এঁর নাম হচ্ছে— 'রামকৃষ্ণ' আর থাকেন আমার বুকে''—

দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরাধিক কাল পরে, ভারত যেন তাঁকে এবার চিনতে পেরেছে, বিশেষতঃ বাংলাদেশ যেন তাঁকে, স্বামীজীর মতই বুকে নেবার চেষ্টা করেছে। তাঁর আগমনবার্ত্তার বোধন-বাঁশী বেজে উঠেছে; জন্মাষ্টমী ব্রতের সাড়া দিয়েছে; সঙ্গে সঙ্গে আমারও দেহ-তরী তাঁদের সুরে সুর মিশিয়ে যেন গেয়ে উঠেছে—

''স্মর গরলখণ্ডনং, মম শিরসিমণ্ডনং।
দেহি, পদপল্লভ মুদারম্‌।।''

রামকৃষ্ণদেব একদিন গঙ্গাস্নানে নেমে, হাঁটু জল পর্য্যন্ত এগিয়ে গিয়ে দেখলেন এক ঝুড়ি কাঁচা আম তাঁরই চোখের সামনে ভেসে যাচ্ছে— আমগুলোকে প্রণাম জানিয়ে বলতে লাগলেন—তোমরাও মায়ের কোলে স্থান পেয়েছ? এমনি সবাই মায়ের কোলেই স্থান লাভ করে বসে আছে কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না। তোমরাও বোধহয় বুঝতে পারছ না যে, এক মায়ের কোল থেকে ঝরে পড়ে, অন্য মায়ের কোলে চড়েছ, মায়ের চরণে যারা ফুল দেয়, তারাই এই মায়ের পূজার ফলাফল লাভ করে। ধরিত্রী মাতার কোলে সব মানুষই বাস করে কিন্তু যতক্ষণ না ভূমিকম্পন হয়, ততক্ষণ তারা যেমন বুঝতে পারে না, ফলের ঝুড়িটাও তেমনি, ঢেউ না খেলে মায়ের কোলে যে ভাসছে, তা বুঝতে পারে না।

সৃষ্ট মানবগণ যে, সেই পরমাত্মার সঙ্গেই যুক্ত—এ রহস্য বুঝতে পারে না; শান্ত সমুদ্রে পারের নৌকার মতই ধীর ও স্থির হয়ে নিজের অহংজ্ঞানে জীবন কাটায়। ঢেউয়ের তালে, জাহাজ তরী যেমন নেচে ওঠে, বিশ্ব নরনারীর অন্তরাত্মাও যখন জেগে ওঠে, তখনই তারা বুঝতে পারে যে, তারা এক অদৃশ্য-শক্তি দ্বারা পরিচালিত। শান্ত বা ধীর বাতাস যখন আমরা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে গ্রহণ করি, তখন যেমন বুঝি না যে, আমরা হাওয়া ভিন্ন বাঁচি না, মানুষের অন্তরাত্মার জাগরণ না হলে, তার দোলা না খেলে, সে বুঝতে পারে না যে, এক অদৃশ্য শক্তিই তাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। পেটের মাঝে শিশু যেমন নিবাত এবং নিষ্কম্প, অহংজ্ঞানী মানুষও তেমনি নিজের জালে জড়িয়ে পড়ে সংসার ধর্ম্ম-কর্ম্মকে নিজের কর্ম্মই মনে করে। পেটের শিশু মাটিতে আছড়ে পড়লে

যেমন কেঁদে ওঠে, মানবাত্মা জেগে উঠলে বা পরমাত্মার সন্ধান পেলে, মানুষও তেমনি ভাবের ঘোরে কাঁদতে থাকে। সেই বিশ্বপ্রকৃতির সেই বিশ্বমাতার সাড়া পাওয়ার নামই অন্তরাত্মার জাগরণ বা পাষাণ প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। আত্মাই যে পরমাত্মা, সেই অমর তত্ত্বে উপনীত হওয়া বা সেই অমরত্ব লাভ করতে হোলে মানুষকে প্রথমে পাষাণ মূর্ত্তি বা অমর মূর্ত্তির পূজা করতে হয়। সমস্ত ধর্ম্মের মধ্যেই তাই মন্দির, গির্জ্জা এবং মস্‌জিদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত।

সেই অমর পথের যাত্রীগণের বা সাধকবর্গের অন্তরাত্মা যখন জেগে ওঠে, তখন তারা স্বতঃই বলে ওঠে— ''রামঃ, রামঃ''। অহংজ্ঞান, মর জগৎ থেকে অমর জগতে চলতে থাকে। অহংজ্ঞানের নিগূঢ় বন্ধনকেই পাষাণ-প্রতিমা বলে; এই নিগূঢ় বন্ধনের গূঢ় রহস্য জানাকেই মা মহামায়া বা মায়ার জগৎ বলে। মায়িক জগতের ভূ-কম্পন এবং অন্তরাত্মার জাগরণের নামই অমর নাম বা ''রাম'' নাম। সত্যের জাগরণকেই সীতা সতী বলে। মায়ার আবরণ উন্মোচন হলে, সেই অমর জগতে সাধকরূপী রামের হয় বনবাস। মনোবাসই মুনি-ঋষির বাস বা মৌনবাস। এই মৌনবাসের অন্য নাম পাষাণ কারাগার, বল্মীক স্তূপ বা কংস কারাগার এবং শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী।

রামকৃষ্ণদেব, এই পাষাণ কারাগারে আবদ্ধ হয়ে, পাষাণের মাঝে পাষাণ প্রতিমার চরণে রাঙা ফুল দিয়ে পূজা করতে করতে, নিজের মাথায় ফুল-মালা এবং চন্দন-তিলক পরিয়ে তাই বলে উঠেছেন— ''মা! মা! তোরই গাছের ফুল, যা গাছের শির থেকে, পায়ের তলায় ঝরে পড়েছিল, আবার তাই আমার শিরদেশে হেসে উঠলো। তোরই শিরের ফুল কখনও পায়ে পড়ে, আবার কখনও তারাই তোরই মাথায় স্থান লাভ করে।''

সত্যই তাই, আমরাও দেখি, যে রামকৃষ্ণদেবকে একদিন লোকে পাগল বলেছিল, আজ তাকেই আবার শিরে তুলে পরমপুরুষ বলে কবিতার ছন্দেও বাঁধতে চায়, কালের গতিই এইরূপ। কালের সূক্ষ্ম বিচার গতিকেই মহাকাল বলে।

বল্মীক স্তূপের পাষাণ কারাগার ভেঙে, কালের গতিতে চোর রত্নাকর হলেন বাল্মীকি মুনি। মহাকাল পূজায় তিনি তাই রাম জন্মাবার বহুকাল আগেই রামায়ন রচনা করলেন।

জড়ত্ব বা পশুত্বভাবের পরিণাম কালকেই মহাকালের স্বরূপ-সন্ধান বলে। কালের বিচিত্র গতিতে সব মানুষকেই সেই আদিকালের অমৃতস্বরূপে ফিরে যেতে হয়। ভারতের মহামহিমায় ফিরে যাওয়ার নামই মহাভারত। কাশীরাম দাসও তাই কথায় কথায় কাব্যের ছন্দে গেয়ে উঠেছেন— ''মহাভারতের কথা অমৃত সমান।''

অনন্ত আকাশ, বাতাস বা সূর্য্য, চন্দ্র যেমন আকারধারী হয়ে, আমাদের চোখের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে, সেই বিশ্ববিধাতাও ক্ষুদ্রাকারে আমাদের চোখে সাধন পর্য্যায়ে ধরা দেয়। ক্ষুদ্র বীজের মাঝে যেমন মহান্ মহীরুহ লুকিয়ে থাকে এবং আলো জল, বাতাসে যেমন তা বৃক্ষাকারে বেরিয়ে আসে, মানব-হৃদয়েও তেমনি সেই আদ্যাশক্তি জগন্মাতা সাধনার দৃষ্টিতে ধরা দেয়।

রামকৃষ্ণদেবও তাই, পূজার মাঝে সেই জগন্মাতার সঙ্গে কথা বলতেন, কখনও পাষাণ-প্রতিমার মাঝে মায়ের প্রাণবন্ত আকৃতি দেখে, তাঁরই চরণে ফুল, গঙ্গাজল দিতেন, বা কখনও নিজের অঙ্গেই তাঁর স্বরূপ দর্শন করে, নিজের পায়েই তুলসী-চন্দন দিয়ে, 'মা-মা' বলে কেঁদে আকুল হতেন। আত্মার মাঝে পরমাত্মার লীলা-রহস্য দেখতে দেখতে যখন নিজের অহং জ্ঞানে ফিরে আসতেন, তখনই আবার আকুল হয়ে কেঁদে উঠে বলে যেতেন— ''একী মা! তুই একী করলি? তুই নিজের চরণে ফুল না নিয়ে, আমার চরণেই ফুল দিয়ে পূজা করলি?''

নিজের পাষাণ দেহ, দর্পণসম উজ্জ্বল হয়ে যখন সম্মুখের পাষাণ-প্রতিমার উপর নিপতিত হত, তখনই তিনি আবার পাষাণ মূর্ত্তির সঙ্গে কথা কইতেন। জড় ও জীব এক হয়ে যেতো, নিজের মতই সেই পাষাণ প্রতিমাকে ভালবাসতে পারতেন।

বিবেকানন্দও এমনি রামকৃষ্ণদেবের পূজার ঘরে, নিজের অঙ্গ, সেই পাষাণ প্রতিমায় প্রতিবিম্বিত দেখে, কেঁদে আকুল হলেন এবং রামকৃষ্ণদেবের চরণ ধরে বলতে লাগলেন— ''আজ আমার একী হল প্রভু! কেন আজ তোমার মাঝে আমাকে দেখি?''

রামকৃষ্ণদেব তাঁর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলে যেতে লাগলেন— ''মায়ের পাষাণ-কারাগরে তোরও আজ জন্মাষ্টমীর ব্রত উদ্‌যাপন হল। এবার তুই মায়ের পাষাণ-মূর্ত্তির দিকে চেয়ে দ্যাখ্—কত সূর্য্য চন্দ্র ঐ পাষাণ-মূর্ত্তির মাঝেই দোল খাচ্ছে! মা-কি আমার পাষাণ?''

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, পাড়া-প্রতিবেশীদের ঘর থেকে শাঁখ ঘন্টার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, মন্দিরে প্রতিমার আরতি

বাজনা বেজে উঠেছে, ভক্ত নরনারীতে মন্দিরের সম্মুখাংশ ভরে গেছে, কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের দেখা নাই; আকাশে মেঘ উঠেছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকানি, এমন কি মন্দির মাঝেও ঝিলিক মারছে, কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের সে দিকে লক্ষ্য নেই, গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে, অনন্ত মেঘের পানে তাকিয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলছেন— ''মা! মা! তুই মেঘের মাঝে থেকেও লুকোচুরী খেলিস? চিরদিনই কি এমনি করে লুকোচুরী খেলবি? মেঘগুলো যে তোর পেছন পেছন ছুটছে, তাদের দিকে কি একটুও চোখ ফেলবি নে? কেবল বিদ্যুতের হাসি দেখিয়ে বেড়াবি? মেঘগুলোও ত তোরই ছায়া, তবে তোর কায়ার সঙ্গে কবে মিশবে? মায়ার আবরণও ত তোরই দেওয়া। ওদের মায়ার ঘোমটা তুলে দে মা'' ... এই বলতে বলতে, রামকৃষ্ণদেব তাঁর বাম হাতখানা বুকের উপর রেখে, দখিন হাতখানা উর্দ্ধগামী কোরে জড়সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন।

রাধার কথাও মনে পড়ে যায়, যখন তিনি যমুনায় জল আনতে গিয়ে, যমুনার কালজলে শ্যাম দর্শন করে গেয়ে উঠেছেন— ''শ্যাম নিরখি, যমুনার জলে কেমনে বাড়াব পা? শ্যামশিরে মোর ঠেকিবে চরণ, কেমনে ভেজাব গা?''

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমুদ্র দর্শনে এমনি ভাবেই কেঁদে উঠেছেন— ''হরিগুণ গায় আকাশে বাতাসে, সাগরের জলে হরি; কৃষ্ণগুণ গায় নীল সায়রে, আহা মরি! আহা মরি!''

...ক্রমশঃ

প্রারব্ধ ভোগ ও মিলনে বিশ্বাস

শ্রীগোবিন্দদাস উদাসী বাবা

প্রারব্ধ ভোগ আর কিছুই নহে - পাপ ও পুণ্যের ফলভোগ করা মাত্র। পূর্বাকৃত সুকৃত ভোগের সময় যখন আসে তখন সুখের উদয় হয়। আবার পূর্বাকৃত দুষ্কৃত ভোগের সময় যখন আসে তখন দুঃখ উদয় হয়। সুকৃত বা দুষ্কৃত তো পূর্বেই করা হইয়া গিয়াছে। জ্ঞানে হউক বা অজ্ঞানে হউক পূর্বে যাহা করা হইয়া গিয়াছে, তাহার ফল ভোগ করিতে হইবেই। সে জন্য বিচলিত হওয়া তো কোন কাজের কথা নয়, ইহাতে কোন লাভ নেই। যাহা হইবার হউক বলিয়া 'গুরু গুরু' বা 'হরি হরি' বলিয়া সকল সহ্য করিয়া যাইতে হইবে। 'গুরু গুরু' বলিয়া সহ্য করাই ভাল। অযথা বিচলিত হইয়া ছুটা-ছুটি করিলে কি প্রারব্ধ ভোগ শেষ করিতে পারিবে? প্রাবব্ধ ভোগ শেষ হইলেই আর এ দেহটা থাকিবে না। আর দেহটা না থাকিলেই ভগবান তোমার সহিত মিলিত হইবেন।

মিলন সুখের আশায় যখন হৃদয় ভরিয়া যায় তখন জগতে আর কিছু থাকে কি? যে মিলনে আর ছাড়াছাড়ি নেই বা জগতের বিভিন্ন লোকের সঙ্গে আর সঙ্গ করিতে হয় না। একবার ভেবে দেখ দেখি সেই মধুর মিলনে কত সুখ ও আনন্দ পাওয়া যায়। এই জগতের সমস্ত সুখ, দুঃখ, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, মিথ্যা অপবাদ — সেই চির মধুর মিলন সুখের আশায় সকল সহ্য করিয়া যাও। তবে তো দেহান্তে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, নির্মল ও পবিত্র হইয়া তাঁহার পাশে দাঁড়াইতে পারিবে।

বিশ্বাস রাখ অবশ্য মিলিবে। মিলনের আশায় গুরুকে শরণ করিয়া প্রারব্ধ ভোগ সহ্য করিয়া যাও। কারে শরণ করিবে? যিনি সকলের সুহৃত বন্ধু তাঁকে। তিনি যে তোমার পরম সুহৃত বন্ধু। তিনি আত্মাই হউন, ব্রহ্মই হউন, গুরুই হউন, পতিই হউন। মাতা পিতা, পুত্র-কন্যা আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকল এক করিয়া সেই বিশ্ববিধাতা প্রেমিক পুরুষকে শরণ করিবে। যারে দুঃখী জীব মাত্রেই শরণ করে। যারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শরণ করে, তাঁরে কেবল শরণ কর। যিনি ভবার্ণবের কর্ণধার, যিনি অকুলের কাণ্ডারী, যিনি পতিত পাবন, পাতকী তারণ, যিনি শান্তির আধার, যিনি ভীতের আশ্বাস, ব্যথিতের শান্তি, তাঁরে শরণ কর। সকলে যদি কোন অপরাধে তোমাকে ত্যাগ করে, তাহলেও কিন্তু বিশ্বপ্রেমিক অতি বিপদে শত অপরাধ করিলেও ক্ষমা করিবেন। সেই বিপদভঞ্জন অনাথ বন্ধুকে শরণ কর।

এস ভাই ক্ষণিকের সুখের আশা ছাড়িয়া আমরা সেই চিরানন্দময় জীবনের চিরসাথীকে শরণ করি। এত ত্রিতাপ জ্বালায় অস্থির হইতেছি, তবুও সেই অনিত্যের মোহে জড়াইয়া আছি। এস ভাই আমরা সেই প্রাণের দেবতার সন্ধান করি। এই দুনিয়াতে তাঁহার ন্যায় ভালবাসিতে কেহ জানে না। সে যে প্রাণের প্রাণ তাঁকে ছুঁইতে না পারিলে কিছুই হইবে না। নতুবা কেবল কাঁটাবন দিয়া ছুটিয়া মরা সার হইবে।